কল্পনা চাকমা

সালাম আজাদ

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

॥ এক ॥

বাংলাদেশে নতুন পোস্টিং হয়েছে সিসিলিয়া থমসনের। এদেশে আসার আগে দেশটি সম্পর্কে সে পড়াশুনা করে নিয়েছে যে দাতা সংস্থাটির হয়ে সে ঢাকায় এসেছে তার সদর দপ্তর গুলশানে। ঢাকার পস্ এলাকাগুলোর একটি। অফিস থেকে একই পাড়ায় তার জন্য একটি ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা হয়েছে। একটি গারো ছেলে তার ড্রাইভার। দুই পুরুষ আগে এই গারো ছেলেটি ক্যাথলিক হয়েছে। এই ছেলেটি ছাড়াও আরো দু'টি গারো মেয়ে তার রান্নার কাজ সহ অন্যান্য কাজ করে দেয়। গারো মেয়ে দু'টি খ্রিস্টান। তবে ক্যাথলিক নয়। প্রোটেস্ট্যান্ট। এই মেয়ে দু'টি তার নিজস্ব স্টাফ। ড্রাইভারের বেতন অফিস থেকে দিলেও মেয়ে দু'টির বেতন তাকেই দিতে হয়। আগামীকাল চারমাস পূর্ণ হবে তার এই শহরে। এই চারমাসে সে মেয়ে দু'টিকে যে বেতন দিয়েছে তা তার এক সপ্তাহের আয়ের অনেক কম। এক রাতে তার ঘুম আসছিল না। তখন হঠাৎ করে এই মেয়ে দু'টির কথা তার মনে পড়ে যায়। যারা তার পাশের ঘরেই ঘুমিয়ে আছে। সে নিজে মেয়ে বলেই কি এই মেয়ে দু'টির প্রতি বৈষম্য তাকে স্পর্শ করছে। তার নিজের দেশ কানাডাতে। এতো কম বেতনে লোক পাওয়া ভাবনার বাইরে। বাংলাদেশ বলেই কি এতো কম বেতনে কাজের লোক পাওয়া যায়। হয়তো তাই। কিন্তু সে তো নিজেও মেয়ে। পার্থক্য এই তার জন্ম কানাডায়। সেখানেই পড়াশুনা করেছে। এই মেয়ে দু'টি পড়াশুনা তেমন করতে পারেনি। যদি তা করতে পারতো, এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিতে পারতো তাহলে কি মেয়ে দু'টি তার সমান পদে কাজ পেত, না পেত না। তারা লোকাল স্টাফ হিসেবে বেতন পেত টাকায়। তার মত ডলারে নয়। এরকম একাধিক ছেলে মেয়ে তার অফিসে লোকাল স্টাফ হিসেবে কাজ করছে। যাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী রয়েছে। কিন্তু তারা কেউ ডলারে বেতন পায় না। টাকায় যে বেতন তারা পায় তা সিসিলিয়ার এক-দশমাংশও নয়। যদিও তাদের চেয়ে বড় কোন ডিগ্রী সিসিলিয়ার নেই।

এই চারমাসে ঢাকার বাইরে তার তেমন কোথাও যাওয়া হয়নি। কক্স বাজার গিয়েছিল একবার। কিন্তু সী বীচ তার ভাল লাগেনি। সী বীচে যেভাবে গায়ে রোদ লাগানোর ব্যবস্থা থাকে কক্স বাজারে তা থাকলেও এলাকাটি তার কাছে নিরাপদ মনে হয়নি। দু'দিন পরেই সে ফিরে এসেছে। সাতক্ষীরা গিয়েছিল সড়ক পথে। নিজেদের সংস্থার সাহায্যপুষ্ট একটি এনজিও'র কার্যক্রম দেখতে। সাতক্ষীরা যাওয়ার পথে সে

বাংলাদেশের গ্রাম দেখেছে প্রাণ ভরে। একটি দেশের গ্রাম না দেখলে সে দেশটি দেখা হয় না। শহর, বিশেষ করে রাজধানী শহর তো মেকাপ-করা মুখের মতো। একটি দেশের তিনটি দিক খুব গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে। দেশটির গ্রামের মানুষ তথা গ্রাম এবং সে দেশটির নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এই তিনটি দিক যদি ভাল হয়, ভাল থাকে তাহলে দেশটিকে সে ভাল দেশ বলতে রাজী আছে। কিন্তু বাংলাদেশে চারমাস অবস্থানের অভিজ্ঞতা তার ভাল নয়। এখানে আরো এক বছর আটমাস থাকতে হবে। দুই বছরের চুক্তিতে সে এখানে এসেছে।

যে প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়ে তার ঢাকায় আসা সেই প্রকল্প এলাকায় এখনো তার যাওয়া হয়নি। সেখানে যেতে হলে এদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি লাগে। অনুমতি চেয়ে সে আবেদন করেছে। কিন্তু প্রায় একমাস হয়ে গেলেও অনুমতি পাওয়া যায়নি। তবে তার প্রকল্প এলাকার কয়েকজনের সঙ্গে বিভিন্ন সময় ঢাকায় দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে। সেই এলাকার জন্য সরকারের একটি পৃথক মন্ত্রণালয় রয়েছে। সেই মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সে মিটিং করেছে। যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ভাবেন, কাজ করছেন, কথা বলছেন, লিখছেন তাদের আনন্দের সঙ্গে সে কথা বলেছে। এখন সে অপেক্ষা করছে অনুমতির। তা পাওয়া গেলেই সিসিলিয়া চলে যাবে তার প্রকল্প এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রাম সরেজমিনে দেখতে। সেখানে সে কিছুদিন থাকতে চায়। কথা বলতে চায় স্থানীয় মানুষের সঙ্গে। নারী পুরুষের সঙ্গে। প্রশাসনের সঙ্গে। সেনা প্রশাসনের সঙ্গে। জন-প্রতিনিধি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে।

একমাস পূর্ণ হওয়ার দু'দিন আগেই সে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পেয়ে গেল। তার একজন এদেশীয় সহকর্মী অনুমতিপত্রটি এনে তার হাতে দিল। অনুমতি পত্রে লেখা না থাকলেও এই সহকর্মীটি তাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শোনালো। যার প্রায় সব কিছুই সিসিলিয়ার জানা। তবুও সে আগ্রহী শ্রোতার মত সে সব কথা শুনলো। সহকর্মীটি চলে যাবার পর সে বসের ঘরে গেল অনুমতি পত্রটি হাতে করে। বস্ তা পড়ে সিসিলিয়া-কে অভিনন্দিত করলো।

বস্ ঃ কবে যেতে চাও?

সিসিলিয়া ঃ এক সপ্তাহ পরে। আগামী সোমবার।

বস্ ঃ অনুমতি তো এখন তোমার হাতে, এক সপ্তাহ পরে কেন?

সিসিলিয়া ঃ কিছু কাজ জমে গেছে, তা শেষ করে যেতে চাই। তাছাড়া সেখানে যাওয়ার আগে কিছু হোমওয়ার্ক করে যেতে চাই।

বস্ ঃ ঠিক আছে। তোমার সুবিধামতই যাবে। তবে যাবার আগে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ইনফর্ম করতে ভুলো না।

সিসিলিয়া ঃ সেটা আপনি অফিসিয়ালি জানালে কিন্তু ভাল হবে।

বস্ ঃ ঠিক আছে আমি আগামী কালই জানিয়ে দেব। সোমবার কখন রওনা করবে, প্রথম কোথায় যাবে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি না বান্দরবান।

সিসিলিয়া ঃ সোমবার সকাল সাতটায় ঢাকা থেকে রওনা দেব। প্রথম খাগড়াছড়ি।

বস্ ঃ তোমার সঙ্গে আর কেউ যাচ্ছে কি?

সিসিলিয়া ঃ সঞ্জীবকে নিয়ে যাব।

বস্ ঃ সঞ্জীব মানে?

সিসিলিয়া ঃ আমার ড্রাইভার। সঞ্জীব দ্রং।

বস্ ঃ ও সব চিনে সে অঞ্চলের। ঠিক আছে। সার্কিট হাউসে উঠবে তো?

সিসিলিয়া ঃ না, পর্যটনের মোটেলে। আজই বুকিং দিয়ে দিচ্ছি।

বস্ ঃ ঠিক আছে। কতদিন থাকতে চাও এবার?

সিসিলিয়া ঃ এখন নির্দিষ্ট করে বলতে পারছিনে। আমি সব সময় যোগাযোগ রাখবো।

বস্ ঃ ঠিক আছে।

কোথাও রওনা করার আগে কিছু প্রস্তুতি সকলেরই প্রয়োজন হয়। সিসিলিয়ারও তা হলো। পর্যটনের ঢাকায় যে বুকিং অফিস রয়েছে সেখানে ফোনে সে বুকিং দিয়ে দিল। খাগড়াছড়িতে পর্যটনের মোটেল চালু করা হয়েছে এ বছর জানুয়ারিতে। দেশী-বিদেশী সকলের জন্যই খাগড়াছড়ি মোটেলে পঁচিশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট। নতুন বলেই এই কমন ডিসকাউন্ট। সিসিলিয়া দু'টি রুম বুকিং দিল। একটি তার জন্য, অন্যটি তার ড্রাইভারের জন্য। একটি এসি, অপরটি নন-এসি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে রিপোর্ট করে এ রকম একজন সাংবাদিক একদিন তার অফিসে এসেছিল। তার সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির বিষয়টি নিয়ে সিসিলিয়া কথা বলেছিল। সাংবাদিক তাকে জানিয়েছিল, ব্রিটিশ শাসন আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০ নামে একটি আইন প্রণীত হয়েছিল। এই আইন প্রণয়নের ফলে জুম্ম জনগণের অনেক অধিকার খর্ব করা হলেও পাহাড়িদের প্রথাগত, সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত ভূমি মালিকানাস্বত্ব এই শাসন বিধিতে স্বীকৃত হয়। এই শাসন বিধিতে পাহাড়ি আদিবাসীদের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, তাতে সুনির্দিষ্টভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা পাহাড়ি আদিবাসীদেরই বুঝানো হয়েছে। এই অঞ্চলের ভূমি মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর পদ্ধতির ক্ষেত্রে মৌজার হেডম্যানের রিপোর্ট এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক তা অনুমোদন প্রদান ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়েছিল। রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় কারবারি, হেডম্যান, সার্কেল চিফ ও জেলা প্রশাসককে। অর্থাৎ সাধারণ পাহাড়ি জনগণের কাছ থেকে খাজনা তুলবে কারবারি। সে তা দেবে হেডম্যানকে। আর হেডম্যান দেবে সার্কেল চিফ বা রাজাকে। রাজা দেবে জেলা প্রশাসক তথা সরকারকে। এই শাসন বিধিতে সংগৃহীত রাজস্ব থেকে কারবারি, হেডম্যান ও রাজা কে কতটুকু অংশ পাবেন

তা সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ রয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন সমষ্টিগত অধিকার অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির ওপর সে অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের মালিকানা স্বত্বকে স্বীকৃত দেওয়া হয়ে থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে খাস জমি কার্যত ছিল না। ভারতীয় উপমহাদেশ বিভাগের প্রাক্কালে 'ভারত স্বাধীন আইন ১৯৪৭' নামে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক যে আইন প্রণীত হয়েছিল, উক্ত আইনে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান এবং অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে ভারত গঠনের কথা বলা হলে ৯৭.৫% অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অন্তর্ভুক্তির দাবি তোলে সে অঞ্চলের জনগণ। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে সে অঞ্চলের মানুষ শুরু থেকেই পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে। পাকিস্তান সরকার জুম্ম জনগণকে শুরু থেকেই পাকিস্তান বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ভারত থেকে বিতাড়িত কয়েক হাজার শরণার্থীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি লঙ্ঘন করে সে অঞ্চলে তাদেরকে বসতি প্রদান করা হয়।

তাছাড়া ষাট সনে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের শস্যভাণ্ডার বলে খ্যাত চুয়ান্ন হাজার একর জমি পানিতে নিমজ্জিত হয় এবং এক লাখ জুম্ম নাগরিক উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। যাদের অনেককেই আজ পর্যন্ত পুনর্বাসন করা হয়নি। জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে উনাশি সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির কয়েকটি ধারা পরিণত ও সংশোধন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ১৯৭৮-৮৫ এই আট বছরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাঙালি মুসলমানকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নেওয়া হয়। এই পঞ্চাশ হাজার সেটেলারকে সম্পূর্ণভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং রাবেতার মত মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক এনজিওর আর্থিক সাহায্যে পুনর্বাসনের নামে জুম্ম জনগণের বাস্তুভিটা চাষের জমি দখল করে আদিবাসীদের নিজস্ব ভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সেটেলার কর্তৃক জুম্ম জনগণের জমি ও বাড়ি জবরদখল করার ফলে তারা শুধু বিতাড়িতই হয় না, তাদের ভূমি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক-দশমাংশ হলেও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষযোগ্য জমি নেই। ওদিক থেকে দেখলে জনসংখ্যার ঘনত্ব কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রামে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশী। সাংবাদিক ভদ্রলোক সিসিলিয়ার কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জমির প্রকৃতির একটি বিবরণ তুলে ধরলেন। নিজের বক্তব্যকে আরো বেশী স্বচ্ছ করে তোলার জন্যই তা তুলে ধরা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে জমি রয়েছে তার মাত্র ৩.১% জমি সব রকম কাজের উপযোগী। এই জমির পরিমাণ এক লাখ চব্বিশ হাজার একশো ষাট একর। থাক কাটার পর কৃষি বা উদ্যান চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ ২.৭% অর্থাৎ এক লাখ দশ হাজার আশি একর। উদ্যান বা বনচাষের উপযোগী জমির পরিমাণ ১৪.৭% অর্থাৎ পাঁচ লাখ

তিরানব্বই হাজার একশো কুড়ি একর। শুধু বন করার উপযোগী জমি রয়েছে ৭২.৯% উনত্রিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার তিনশো ষাট একর। বন করার উপযোগী তবে পর্যাপ্ত থাক করার পর উদ্যান চাষ উপযোগী একান্ন হাজার আটশো চল্লিশ একর বা ১.৩% এবং সেটেলমেন্ট ও পানি দুই লাখ চোদ্দ হাজার চারশো একর বা ৫.৩%। পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট জমির পরিমাণ চল্লিশ লাখ সাঁইত্রিশ হাজার সাতশো ষাট একর। যার মধ্যে মাত্র একলাখ চব্বিশ হাজার একশো ষাট একর অর্থাৎ মোট জমির মাত্র ৩.১% ভূমি সব কাজের উপযোগী।

সাংবাদিক ভদ্রলোক সিসিলিয়াকে আরো বলেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ইত্যাদি কারণে জুম্ম জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান কখনোই সংগৃহীত হয়নি। এমনকি ১৯৮১, ১৯৯১ এবং ২০০১ সালের জনগণনার যে হিসাব সে পরিসংখ্যান থেকেও জুম্ম জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাদ পড়ে যায় কিংবা বাদ রাখা হয়। এ রকম ঘটনা এদেশের প্রায় প্রতিটি আদিবাসীর ক্ষেত্রেই করা হয়েছে। বাংলাদেশে মোট আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে পঁয়তাল্লিশটি। কিন্তু কোন সেনসারেই পঁয়তাল্লিশটি আদিবাসীর উল্লেখ নেই। মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি আদিবাসীর কথা উল্লেখ রয়েছে, তাদের আবার সঠিক জনসংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়নি। বলা বাহুল্য প্রকৃত জনসংখ্যার চেয়ে কম দেখানো হয়েছে। আর তা অবশ্যই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। সে কথা মনে রেখেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার একটি পরিসংখ্যান তিনি সিসিলিয়ার কাছে তুলে ধরেছিলেন। ১৮৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৯,৬০৭ জন। এরমধ্যে হিন্দু ৮৫জন। মুসলমান ১৯৭ জন। বৌদ্ধ ৬৮,৬০৭ জন এবং অন্যান্য ৯৭১৮ জন। অর্থাৎ বাঙালী ২৮২ জন এবং আদিবাসী পাহাড়ি ৬৯,৩২৫ জন। ১৯৪১ সনে এই অঞ্চলে মোট জনসংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২,৪৭,০৫৩ জন। এরমধ্যে হিন্দু ৫,৬৯১ জন। মুসলমান ৭,২৭০ জন এবং পাহাড়ি ২,৩৩,৩৯২ জন। অর্থাৎ বাঙালী ১২,৬৬১ জন এবং পাহাড়ি ২,৩৩,৩৯২ জন। কিন্তু ১৯৯১ সনের জনগণনায় পুরো চিত্রটি বদলে যায়। পাহাড়ি এবং বাঙালীর প্রায় সমানে এসে দাঁড়ায়। এ বছর যে জনগণনার হিসাব তাতে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট জনসংখ্যা ৯,৭৪,৪৪৫ জনের মধ্যে পাহাড়ি ৫,০১,১৪৪ জন এবং বাঙালী ৪,৭৩,৩০১ জন। অর্থাৎ পাহাড়ি ৫১% এবং বাঙালী ৪৯%।

বর্তমান অবস্থাটা ঠিক কি, জানতে চায় সিসিলিয়া।

সাংবাদিকঃ এখন অবস্থা তো ভয়াবহ।

সিসিলিয়াঃ কেমন ভয়াবহ।

সাংবাদিকঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর সে অঞ্চলে সেটেলার নেওয়া কিছুদিনের জন্য স্থগিত ছিল। কিন্তু অষ্টম সংসদ নির্বাচনে একজন সেটেলার খাগড়াছড়ি থেকে